অরাবীন্দ্রিক রবীন্দ্রনাথ

পাঁচুগোপাল বক্সি

পুনশ্চ

৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন

কলকাতা-৭০০ ০০৯

ভূমিকা

শুধু পঁচিশে বৈশাখে নয়, বিশেষ করে বাঙালি জাতির হৃদয়বেদিতে যে ঠাকুরের নিত্য বন্দনা, সেই রবি ঠাকুর কেমন ঠাকুর; তিনি কি বিশেষ কোনো আধ্যাত্মিক তত্ত্বের মূর্তিমান বিগ্রহ বা মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য, ঠাকুর রামকৃষ্ণের দেশে তিনি কি অবতার বিশেষ? তিনি মানবরূপী দেবতা? অতিমানব? অথবা মহর্ষির পুত্র একাত্মবাদী ঋষিকবি বা ব্রহ্মজ্ঞ বৈদিক সাধককুলের সর্বশেষ উত্তরপুরুষ?

চুল-দাড়ি-গোঁফ-জোব্বায় রবীন্দ্রনাথের শরীরের প্রায় চোদ্দ আনাই ঢাকা। মানুষ হিসেবেও তিনি কি অনেকখানি বা পুরোপুরি আড়ালে, না আপন সৃষ্টির মাঝেই মেলে ধরেছেন নিজের মানুষী সত্তা? কে তিনি? তিনি ঠিক কী? এরকম প্রশ্ন জাগবে না-ই বা কেন? সকল সমস্যার সমাধান রবীন্দ্রনাথ; সব প্রশ্নের উত্তর, বিশ্বমানবের সকল ভাবানুভূতির সুন্দরতম ভাষা যে তিনি। বড্ড বেশি রকম অ-সাধারণ বলেই তাঁকে ঘিরে কৌতূহল রহস্য দানা বাঁধে; তাঁকে অমর্ত্যবাসী বলে মনে হয়।

শিল্পী নিজেকেই মেলে ধরেন তাঁর শিল্পে। আপন জীবনের উপকরণ তাঁরা শিল্পে রূপান্তরিত করেন। উৎস, ভূপ্রকৃতি প্রভৃতি অনুযায়ী যেমন নদীর গতিপথ, তার চরিত্র, স্রোতের স্বভাব বদলে যায়; তেমনি বংশধারা, পরিবার, সমসাময়িক আর্থনীতিক, রাজনীতিক, সামাজিক, পরিস্থিতি, শিক্ষাদীক্ষা, বৃহত্তর জগতের সঙ্গে বস্তুময় বা ভাবগত সম্পর্ক প্রভৃতি প্রভাবিত করে ব্যক্তির অনুভূতি এবং জীবনের অভিজ্ঞতা ও উপকরণের সঞ্চয়কে। এই কারণেই কেউ জীবনের কাছ থেকে লাভ করেন প্রচুর উপকরণ এবং সেগুলিকে কাজে লাগান। এই জীবনই তো 'কবির অন্তরে তুমি কবি' যে উপকরণের পুঁজি নিয়ে বলতে পারে :

অঙ্গে অঙ্গে প্রাণ তব
কত গানে কত নাচে
রচিয়াছে
আপনার ছন্দ নব নব
বিশ্বতালে রেখে তাল—
সে যে আজ হল কতকাল! (*ছবি, বলাকা*)

অনেককে জীবন তেমন কিছুই দেয় না। সেই কার্পণ্যের ছাপ পড়ে তাঁদের সৃষ্টিতে, সাধনার অপূর্ণতায়। জীবন রবীন্দ্রনাথকে দিয়েছে অঢেল; দু'হাত ভরে এবং তিনিও মহাকবির প্রতিভায় মহাশিল্পীর সাধনায় সেই অপর্যাপ্ত উপাদান ভাণ্ডারের প্রতিটি কণাকে সম্যক কাজে লাগিয়েছেন, জীবনোপকরণের এই সদ্ব্যবহার সম্পর্কে 'ছবি' কবিতার রেশ টেনেই বলা যায় :

এ জীবনে
আমার ভুবনে
কত সত্য ছিলে!

মোর চক্ষে এ নিখিলে
দিকে দিকে তুমিই লিখিলে
রূপের তুলিকা ধরি রসের মুরতি।

জীবন থেকে পাওয়া রসদকে কবি দেশ-কালাতীত মানবিক, পারমার্থিক ও নিত্যকল্যাণ চেতনায় নিষিক্ত করে বিশেষ তাৎপর্য দান করতে চেয়েছেন। এ প্রসঙ্গে প্রমথনাথ বিশী বলেছেন, "রবীন্দ্রনাথের হাতে জীবন পর্যাপ্ত উপাদান যুগিয়ে দিয়েছে এ বলা যথেষ্ট নয়, তিনি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের সমস্তটাকে শিল্পে পরিণত করতে সমর্থ হয়েছেন, কিছু আর কাঁচামাল হিসাবে উদ্বৃত্ত থাকেনি। জীবনের এমন সামগ্রিক Sublimation সাহিত্যের ইতিহাসে বিরল। তার ফল হয়েছে এই যে, অভিনব বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্যে পূর্ণ রবীন্দ্রসাহিত্য আমরা পেয়েছি; তার একটি ফল হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের জীবনটাকে আমরা পাইনি। যাঁর সম্যক্ জীবন শিল্পে রূপান্তরিত, শিল্পের বাইরে তাঁকে আর কিভাবে পাওয়া সম্ভব?"

কবির শিল্পে পরিণত জীবন ও তার জ্যোতিশ্চক্রের দীপ্তি যুগে যুগে মানুষের কৌতূহল ও আগ্রহ উসকে দেবে। বুদ্ধদেব বসু বলেছেন, A day will come when these works will be minutely read and people with beating hearts will search those pages for a glimpse of him. Little bits will be put together, reconstructed, and thus a final image of him will be stamped on the minds of future generations of Bengalis, (*The Last Days of Rabindranath, Record of a Visit to Santiniketan*) তবে, রবীন্দ্রনাথের মতো মানুষের একটি সম্পূর্ণ ও নিখুঁত প্রতিকৃতি রচনা করা বর্তমান পাঠক ও গবেষকদের মতো ভবিষ্যৎ প্রজন্মের পক্ষেও সম্ভবত দুরূহ কারণ, তাঁর রচনার যেমন যুগচেতনার নিরিখে নানা ভাষ্য হতে পারে তেমনি তাঁর সংস্কারমূলক বিবিধ কর্মপ্রবর্তনা ও ব্যক্তিত্বের মূল্যায়ন-ও নানা মুনির নানা মতে সংশয়ে বিতর্কে নানারকম হতে পারে। তবে, বৈচিত্র্যবিলাসী বর্ণময় জীবনের জন্যে রবীন্দ্রনাথকে যিনি 'The Lord of Life' বলে বর্ণনা করেছেন সেই বুদ্ধদেব বসুর মতো সবাইকে স্বীকার করতেই হবে, "....Rabindranath was as great an artist in life as in literature."

যিনি বেঁচে থাকতেই কিংবদন্তি বা স্বয়ং একটি প্রতিষ্ঠান আর প্রয়াণের পরে বিস্মৃতির গর্ভে হারিয়ে যাওয়ার বদলে আরও বেশি পঠিত, চর্চিত, পূজিত; যাঁর ভাষাতেই আমাদের হর্ষ-বিষাদ-বিস্ময়-প্রেম-রোষ-তিতিক্ষা সব ভাবের মুক্তি; যাঁর সমগ্র রচনাবলি কোনো শতায়ু তন্মন পাঠকের পক্ষে অধ্যয়ন ও উপলব্ধি করা দুঃসাধ্য, সেই দ্বিতীয়রহিত কর্মযোগী জ্ঞানযোগী বিরল প্রজাতির সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ কি এই গ্রহেরই কোনো জীব ছিলেন? আমাদেরই মতো মানুষ ছিলেন? ভুল-ঠিক, পাপ-পুণ্য সংকীর্ণতা-উদারতার মিশেলে গড়া সাধারণ মানুষ থেকে হয়ে ওঠা এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব অথবা কলুষকল্মষহীন দেবদূত—ঠিক কেমন ছিলেন? কী ছিলেন তিনি?

এইসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে বর্তমান লেখককে শিলোঞ্ছের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়েছে। কৃষকেরা ফসল কেটে নিয়ে যাওয়ার পর জমিতে যে শস্যকণা পড়ে থাকে তা সংগ্রহ করে শিলোঞ্ছ যেমন জীবনধারণ করে; তেমনি রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি ও জীবন অবলম্বনে রচিত গ্রন্থমালার বাইরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নানা উপকরণ সংগ্রহ করে অন্তরঙ্গ রবীন্দ্রনাথের একটি

মানুষী মূর্তি গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। আর তা করতে গিয়ে কবির রচনাবলি, চিঠিপত্র, বহুমুখী কর্মপ্রয়াস এবং তাঁর সাহিত্য ও জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে রচিত অন্যান্যদের আলোচনা থেকে সংগৃহীত তথ্য ও সূত্রের সাহায্য নিতে হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের মতো এক বিরাট মাপের দুর্জ্ঞেয় বহুমাত্রিক ব্যক্তিত্বকে নতুন বা একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করা বা এক অন্য রবীন্দ্রনাথকে আবিষ্কার করা কতখানি দুরূহ, তা এই কাজ করতে গিয়ে বোঝা গেছে আর স্পষ্ট হয়েছে এটাও যে, রবি ঠাকুর দেবতা বা দানব নন, রূপকথার নায়ক নন; একান্তই মানব। ধূলিধূসর ধরাধামে কোটি কোটি মরণশীল মানুষের মতোই তিনি-ও মানুষ, যাঁর গার্হস্থ্য জীবনে আচরণে মাঝে মাঝে অসংগতি ধরা পড়ে, যাঁর কথায় ও কাজে অসামঞ্জস্য দেখা যায় বা যাঁর ঘোষিত আদর্শ প্রত্যয় ও সামাজিক কৃত্যাদিতে বৈসাদৃশ্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে—কাঁচভাঙা আয়নায় প্রতিবিম্বের মতো কবির পরিচিত মূর্তিখানি দেখায় অন্য রকম। এই ভিন্ন মূর্তিতেই রবি ঠাকুর আবির্ভূত এখানে।

আমাদের আলোচ্য মানুষটি আর কেউ নন; রবীন্দ্রনাথ যিনি এক কথায় বলা চলে, পরম বিস্ময়; যিনি শুধু ভারতীয় সত্তা সংস্কৃতির নয়, সমগ্র মানবজাতির মন ও মননের ধারক; হাজার হাজার বছরের বিবর্তনশীল ও কয়েক শতাব্দীর বহু পুণ্যের ফলশ্রুতি; যিনি একাধারে সমুদ্রের মতো সদা সংক্ষুব্ধ, শারদাকাশের মতো প্রশান্ত, রামধনুর মতো বর্ণময়, বায়ুর মতো সদাকর্মচঞ্চল। তিনি আমাদেরকে শিখিয়েছেন প্রেম-কল্যাণ-আনন্দ তানে বাজতে, জীবনকে সহজ সুরে বাজাতে।

পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, 'ইদানিং রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর আত্মীয় স্বজনদের সম্বন্ধে স্বকপোলকল্পিত নানা বিষয় প্রায় কবর খুঁড়ে বের করে ঘোলা জলে মাছ ধরার প্রবণতা প্রকট হয়ে উঠেছে, কোনও কোনও রবীন্দ্রজীবী লেখক অধ্যাপকদের লেখায়। সেই দলে নাম লেখাতে আমার রুচিতে বাধে।" (*চিঠিপত্র, 'দেশ'*, ১৭ এপ্রিল, ২০০৫) পূর্ণানন্দবাবুর অনুযোগ সমর্থন করেই বলা, হাউইয়ের সূর্যের মুখে ছাই দেওয়ার দুঃসাহস কাম্য নয়। নানা অসামঞ্জস্য, স্ববিরোধিতা, ছোটোখাটো ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ প্রয়াণের আট দিন আগে নিজ দেহে অস্ত্রোপচারের আগে পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন সৃষ্টিসাধনায় কতখানি ব্যতিক্রান্ত ও বিরল গরিমায় ভাস্বর, সেটা বুঝে নেওয়ার তাগিদই বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধটির প্রেরণা। কবির লেখায় ও কাজে অসংগতির পরিপ্রেক্ষিত, প্রকৃতি ও সম্ভাব্য কারণ বিশ্লেষণের যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে এই রচনাটিতে। রবীন্দ্রনাথ-ও মানুষ। তাঁকে অতিমানব বা মহামানব বললে বোধ হয় সবটুকু বলা হল না; তাঁর প্রকৃত পরিচয় দেওয়া গেল না। তিনি সাধারণের মধ্যে থাকলেও বা লোকায়ত জীবন প্রতিবেশে ও ঘরে-বাইরের ঘটনা পরম্পরায় তাঁর ভাব-ভাবনা লালিত আন্দোলিত হলেও তিনি অ-সাধারণ, মহাজীবনের কারিগর, অমৃতময়। রবির রোদ গায়ে মাখা যায়, তার আলোয় পথ চলা যায় কিন্তু তার ধারে কাছে ঘেঁষা যায় না। রবি ঠাকুরও তেমনি। তাঁর সাহিত্যরসের ঝরনাধারায় সঞ্জীবিত হওয়া যায়, তাঁর তর্জনী সংকেতে সঠিক পথের সন্ধান মেলে অথচ তাঁকে অনুসরণ করা সম্ভব হলেও অনুকরণ করা যায় না। তাঁর কালজয়ী কীর্তিস্তম্ভের পানে মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকা যায় কিন্তু সে-কীর্তির কণামাত্র করতে পারা বা তাঁর মতো হয়ে ওঠার চেষ্টায় ব্রতী হওয়া সাধারণের সাধ্যাতীত। এখানেই তাঁর অসাধারণত্ব। এখানেই তাঁর স্বাতন্ত্র্য,

এই জন্য ছোটো-বড়ো ভ্রান্তি-অসংগতি সত্ত্বেও, ক্ষেত্রবিশেষে অরাবীন্দ্রিক বলে বিবেচিত হলেও আমাদের রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথই। অতিভক্তির ধুপধুনোর ধোঁয়ায় বা হীনম্মন্যতাজাত অসূয়ায় কবির মানুষী সত্তা ঢাকা না পড়লে বোঝা যায় তাঁর গরিমা ও অনন্যতা, স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাঁর সঙ্গে আর পাঁচজনের পার্থক্য। 'শেষের কবিতা'য় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "....আমরা তৈরি করি তৈরি-জিনিসকে ছাড়িয়ে যাবার জন্যেই।" কিছু অসংগতি স্ববিরোধিতা থাকলে-ও রবীন্দ্রনাথ নিজের সৃষ্টিকে ছাড়িয়ে গেছেন, আপন কীর্তির চেয়ে মহৎ হয়ে উঠেছেন।

'লিপিকা'র 'গল্প' রচনাটিতে কবি লিখেছেন, 'এর থেকে দেখা যায়, শুধু শিশুবয়সে নয়, সকল বয়সেই মানুষ গল্পপোষ্য জীব।' কবির কথার রেশ টেনে বলা যায়, আমরা রবীন্দ্রপোষ্য জাতি।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রকাশন সংস্থা 'পুনশ্চ'-র তরুণ কর্ণধার সন্দীপ নায়কের আন্তরিক আগ্রহে বইখানি প্রকাশিত হল। তাঁর কল্যাণ কামনা করি। সপ্তর্ষি নায়ক, রোমিও দে, অমিত সাহা প্রমুখ প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত সকলকে শুভেচ্ছা জানাই। সাহিত্যচর্চায় প্রেরণাদানের জন্যে মঞ্জু বক্সি, ডাঃ সন্দীপন বক্সী, ডাঃ বিদিশা বক্সি, রনেন ও পিয়ালী চট্টোপাধ্যায়, স্বপ্নেশ বক্সি এবং প্রভাসকুমার মুখোপাধ্যায়ের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি। শান্তনু ও বীথিকা চট্টোপাধ্যায়, মমতা এবং প্রদীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ দেওয়ায় তাঁদেরকে ধন্যবাদ। সহযোগিতাদানের জন্যে ডাঃ শিবাজি বসু, শান্তিরঞ্জন দেব ও ডঃ সুজিৎ বিশ্বাসকে অভিনন্দন জানাই।

বইমেলা, ২০০৭

পাঁচুগোপাল বক্সি

॥ ১ ॥

'জীবনস্মৃতি'তে 'ভারতী' পত্রিকা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে কবি লিখেছেন, "এই প্রথম বৎসরের ভারতীতেই 'কবিকাহিনী' নামক একটি কাব্য বাহির করিয়াছিলাম। যে-বয়সে লেখক জগতের আর সমস্তকে তেমন করিয়া দেখে নাই, কেবল নিজের অপরিস্ফুটতার ছায়ামূর্তিটাকেই খুব বড়ো করিয়া দেখিতেছে, ইহা সেই বয়সের লেখা। সেইজন্য ইহার নায়ক কবি। সে কবি যে লেখকের সত্তা তাহা নহে—লেখক আপনাকে যাহা করিয়া মনে করিতে ও ঘোষণা করিতে ইচ্ছা করে, ইহা তাহাই। ঠিক ইচ্ছা করে বলিলে যাহা বুঝায় তাহাও নহে—যাহা ইচ্ছা করা উচিত, অর্থাৎ যেরূপটি হইলে অন্য দশজনে মাথা নাড়িয়া বলিবে, হাঁ কবি বটে, ইহা সেই জিনিসটি।"

'সঞ্চয়িতা'র কবিতাগুলি সংকলনের ভার কবি নিজে নিয়েছিলেন। সতেরো বছর বয়সে প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'কবিকাহিনী'র (১৮৭৮)-র কোনো লেখা 'সঞ্চয়িতা'য় স্থান পায়নি; 'ইতিহাস-রক্ষার খাতিরে'-ও নয়। অল্প বয়সের 'স্খলিত পদে চলতে আরম্ভ' করা লেখাগুলি 'ঠিক কবিতার সীমার মধ্যে এসে পৌঁছয় নি'; কৈশোরে রচিত কিছু গানের মতো 'কবি কাহিনী'র রচনাগুলিকে 'অপরিণত মনের প্রকাশ অপরিণত ভাষায়' বলে বিবেচনা করে কবি বইয়ে ছাপার অক্ষরে সেগুলিকে প্রশ্রয় দিতে চান নি। তিনি বিশ্বাস করেন, '... লেখা যখন কবিতা হয়ে উঠেছে তখন থেকেই তার ইতিহাস।'

কবি কৈশোর ও প্রথম যৌবনের অধিকাংশ রচনা আবেগসর্বস্ব হৃদয়োচ্ছ্বাস ও অপরিণত বিবেচনা করে নির্মমভাবে বর্জন করেছেন তাঁর পরবর্তীকালের কাব্যসংগ্রহ থেকে। তাঁর এই নির্মোহ দৃষ্টির এক ফোঁটা সহানুভূতি পায়নি 'কবিকাহিনী'-ও। অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহের দেহে লম্বমান লেজটি বয়ে বেড়ানোয় যেমন তাঁর বংশধরদের গৌরববৃদ্ধি হয় না; তেমনি ভূরি পরিমাণ যে-সমস্ত লেখাকে কবি ত্যাজ্য বলে গণ্য করেন, যেগুলোকে প্রকাশ করা হলে কবি হিসেবে সম্মান বাড়ে না বরং লজ্জায় মাথা হেঁট হয়—এরকম ধারণার বশবর্তী হয়ে কবি অনাদরে যে-লেখাগুলিকে ফেলে দিতে চেয়েছেন; 'আবর্জনা' স্তূপ ঘেঁটে তার থেকে 'কবিকাহিনী' উদ্ধার করে সেটির পাতায় পাতায় পাই এক সত্যের সন্ধান, প্রদীপ জ্বালার আগে সলতে পাকানোর ইতিহাস—এক কাল্পনিক কবির সারাজীবনের গল্পের ভেতরে এক সত্যিকার কবিজীবনের সংকেত।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত ও শ্রীপ্রবোধচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত 'কবি কাহিনী'র প্রথম সর্গ শুরু হয়েছে এইভাবে :

শুন কল্পনা বালা, ছিল কোনো কবি
বিজন কুটির-তলে। ছেলেবেলা হোতে
তোমার অমৃত পানে আছিল মজিয়া।

সুখময় ঘুমঘোরে স্বপনের মতো
কবির বালক-কাল হইল বিগত।
যৌবনে যখনি কবি করিল প্রবেশ,
প্রকৃতির গীতধ্বনি পাইল শুনিতে,
বুঝিল যে প্রকৃতির নীরব কবিতা।
প্রকৃতি আছিল তার সঙ্গিনীর মতো।

দ্বিতীয় সর্গে যৌবনে ও শূন্যতাবোধে অতৃপ্ত নায়ক কবি বলে ঃ

শুনিয়াছিলাম কোন্ উদাসী যোগীর কাছে—
মানুষের মন চায় মানুষেরি মন;

বনের বালিকা নলিনীকে কবি বলেছে ঃ

প্রকৃতির আছে যত অতুল সৌন্দর্যরাশি
প্রণয়ের আছে যত সুধা হতে সুধা,
কল্পনার আছে যত তরল স্বর্গীয় গীতি,
সকলি হৃদয়ে মোর দিয়াছি ঢালিয়া—

* * * * *

ক্রমে কবি যৌবনের ছাড়াইয়া সীমা,
গম্ভীর বার্ধক্যে আসি হল উপনীত।

* * * * *

প্রেম? প্রেম কোথা হেথা এ অশান্তিধামে?
প্রণয়ের ছদ্মবেশ পরিয়া যেথায়
বিচরে ইন্দ্রিয়সেবা, প্রেম সেথা আছে?

* * *

দ্বেষ নিন্দা ক্রূরতার জঘন্য আসন
ধর্ম আবরণে নাহি করে গো সজ্জিত।

ভাষা ও ছন্দের অপরিপক্কতা বা বয়োধর্ম অনুযায়ী আবেগোচ্ছ্বাসের প্রাবল্যজনিত রচনা-শৈথিল্য মনে রেখেই 'কবি কাহিনী'র তাৎপর্য উপলব্ধি করা যেতে পারে। কাব্যটি রচনাকালে বাংলা সাহিত্য উৎকর্ষের যে পর্যায়ে ছিল বা যে বয়সে এটি রচিত হয়েছিল তা বিবেচনা করে বলা যায়, এতে অপরিশোধিত আকরিক যে ভাব-ঐশ্বর্য আছে তা কিন্তু বিস্ময়কর। উদ্ধৃতিটিতে লক্ষ করা যায়, প্রকৃতি, প্রেম, সৌন্দর্য, মানবতা, বিশ্বানুভূতি অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনের মূল আলম্ব বিষয়গুলির সংকেত এই লেখায় নিহিত। শুধু তাই নয়, স্বদেশ চেতনা, পরাধীন মাতৃভূমি তথা কলঙ্কশৃঙ্খল গলায়' মনুষ্যত্বের অবমাননায় বেদনা, ধর্মের নামে বিকার প্রভৃতি বিষয় ছুঁয়ে গেছে কাব্যটির নায়ক কবি। কৈশোর-যৌবন-বার্ধক্য—জীবনে পর্বান্তরের সঙ্গে সঙ্গে কবির ভাবান্তরের ক্রমিক পরিণতিটিও লক্ষ করার মতো। জীবনের অন্তিম লগ্নে কবি স্বদেশ সংগীত গীতধ্বনিতে কান পেতেছে; ফিরে গেছে প্রকৃতির কোলেই :

একদিন হিমাদ্রির নিশীথ বায়ুতে
কবির অন্তিম শ্বাস গেল মিশাইয়া।
হিমাদ্রি হইল তার সমাধিমন্দির,
একটি মানুষ সেথা ফেলে নি নিশ্বাস।

রোমান্টিক কবিতায় কথক (Protagonist) হিসেবে একজনকে দাঁড় করিয়ে তার মাধ্যমে আপন উপলব্ধি ও আত্মস্মৃতি উপস্থাপনের রীতি অনুসরণ করে রবীন্দ্রনাথ আপন ভবিষ্যৎ জীবনের রূপরেখা এইভাবে অঙ্কন করলেন 'কবিকাহিনী'তে। নকশা অনুযায়ী দক্ষ রাজমিস্ত্রি যেমন অট্টালিকা তৈরি করে, তেমনি প্রত্যয়, অভিপ্রায়, আকাঙ্ক্ষা, কল্পনা প্রভৃতি কী কী উপকরণের মিশেলে কবিজীবনের রংমহল রচিত হবে, তার ছক করলেন কবি এই কাব্যের নায়ক কবির মাধ্যমে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'সে কবি যে লেখকের সত্তা তাহা নহে—লেখক আপনাকে যাহা বলিয়া মনে করিতে ও ঘোষণা করিতে ইচ্ছা করে, ইহা তাহাই।' এ দিক থেকে বলা যায়, 'কবিকাহিনী' রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের নান্দী।

কৈশোরের কিছু অনুকরণধর্মী লেখাকে 'প্রাগৈতিহাসিক', 'ধোবার গাধার বোঝা' বলে কবি বর্জনের পক্ষপাতী হলেও নিজেই স্বীকার করেছেন, 'যার সঙ্গে আমার সাহিত্য-ইতিহাসের দূরবর্তী যোগ আছে' (*রঃ রঃ অচলিত সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, নিবেদন*)। কবি লিখেছেন, 'অতি অল্প বয়স থেকে স্বভাবতই আমার লেখার ধারা আমার জীবনের ধারার সঙ্গে সঙ্গেই অবিচ্ছিন্ন এগিয়ে চলেছে। চারদিকের অবস্থা ও আবহাওয়ার পরিবর্তনে এবং অভিজ্ঞতার নূতন আমদানি ও বৈচিত্র্যে রচনার পরিণতি নানা বাঁক নিয়েছে ও রূপ নিয়েছে। একটা কোনো ঐক্যের স্বাক্ষর তাদের সকলের মধ্যে অঙ্কিত হয়ে নিশ্চয়ই পরস্পরের আত্মীয়তার প্রমাণ দিতে থাকে।'

রবীন্দ্রনাথের কৈশোরে কাব্যচর্চায় যা বীজাকারে ছিল তা ক্রমে পল্লবিত এবং আরও নতুন শাখাপ্রশাখায় বিস্তৃত হয়ে মহীরুহে পরিণত হয়। কবি ভবিষ্যতে কীভাবে নিজেকে তুলে ধরতে চান, তার আভাস মেলে 'কবিকাহিনী'তে। এদিক থেকে রচনাটির ফেনিল আবেগসর্বস্বতা ও গড়নে দুর্বলতা সত্ত্বেও ঐতিহাসিক তাৎপর্য স্বীকার করতেই হয়। এ প্রসঙ্গে শঙ্খ ঘোষের মন্তব্যটি শিরোধার্য, "....'কবিকাহিনী' তো আদর্শ এক কবির গোটা জীবনের কল্পচ্ছবি.... 'লেখক আপনাকে যাহা বলিয়া মনে করিতে ও ঘোষণা করিতে ইচ্ছা করে,' সমস্ত 'কবিকাহিনী'টি নিশ্চয় তেমন এক আদর্শ ধারণার শ্লথ রূপায়ণ মাত্র। কিন্তু সেইসঙ্গে কি এও সত্য নয় যে প্রায় অবিশ্বাস্যভাবে এই আদর্শ ধারণাটিকেই রূপায়িত দেখতে পাই রবীন্দ্রনাথের নিজেরও সমগ্র জীবনে? এই কবিকাহিনী কি প্রকারান্তরে তাঁর ভাবী কবিজীবনেরই একটা ছক তৈরি করে তুলছে না?"

'কবিকাহিনী'তে বিশ্বপ্রেমের ঘটা খুব আছে বলে পরিণত বয়সে রবীন্দ্রনাথ কৌতুক প্রকাশ করলেও অস্বীকার করা চলে না যে, তরুণ বয়সে কবির মনে অঙ্কুরিত বিশ্বপ্রেমের চেতনা ক্রমে কবির জীবনদর্শনে ধ্রুবপদ হয়ে ওঠে। নিজের একটা বিশেষ ভাবমূর্তি গড়ে তোলার বা কবি হিসেবে স্বীকৃতি লাভের উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য সামনে রেখেই রবীন্দ্রনাথ অখণ্ড মনোযোগ ও নিরবচ্ছিন্ন সাধনায় সীমার জগতে রূপ-রস প্রভৃতি আস্বাদনের ভেতর দিয়ে অসীমকে উপলব্ধি করেছেন; নিসর্গলোকের সৌন্দর্য ও মনুষ্যত্বের মহিমা এবং মুক্তির মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে সত্য ও কল্যাণের ধ্যানে মগ্ন হয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালের সাহিত্যচর্চার সময়টিকে বলা যেতে পারে তাঁর জীবনব্যাপী হয়ে ওঠার সাধনার প্রস্তুতিপর্ব। তারপর একটার পর একটা পাপড়ি মেলে শতদল হয়ে ফুটে ওঠার মতো কবিচেতনার ক্রমোত্তরণ ঘটেছে পর্বে পর্বে;

পর্ব—উল্লেখযোগ্য রচনাসম্ভার ঃ কাব্য/নাটক/উপন্যাস/গল্প/ প্রবন্ধ

উন্মেষ পর্ব—'সন্ধ্যাসঙ্গীত' (১৮৮২), 'প্রভাতসঙ্গীত' (১৮৮৩), 'ছবি ও গান' (১৮৮৪), 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' (১৮৮৪), 'কড়ি ও কোমল' (১৮৮৬),/'রুদ্রচণ্ড' (১৮৮১), 'বাল্মীকি প্রতিভা' (১৮৮১), 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' (১৮৮৪), 'মায়ার খেলা' (১৮৮৮), 'রাজা ও রানী' (১৮৮৯)/ 'বউ ঠাকুরানীর হাট' (১৮৮৩), 'রাজর্ষি' (১৮৮৭)।

ঐশ্বর্য পর্ব—'মানসী' (১৮৯০), 'সোনার তরী' (১৮৯৪), 'চিত্রা' (১৮৯৬), 'চৈতালি' (১৮৯৬),/'চিত্রাঙ্গদা' (১৮৯২), 'বিদায় অভিশাপ' (১৮৯৪)/'বিসর্জন' (১৮৯০), 'গোড়ায় গলদ' (১৮৯২), 'মালিনী' (১৮৯৬), 'বৈকুণ্ঠের খাতা' (১৮৯৭)/ 'গল্পগুচ্ছ' ও 'তিনসঙ্গী' গ্রন্থের অনেক গল্প/পঞ্চভূতের ডায়ারি (১৮৯৭)।

অন্তর্বর্তী পর্ব— 'কথা' (১৯০০), 'কাহিনী' (১৯০০), 'ক্ষণিকা' (১৯০০), 'কল্পনা' (১৯০০), 'নৈবেদ্য' (১৯০১), 'স্মরণ' (১৯০২-৩), 'শিশু' (১৯০৩), 'উৎসর্গ (১৯০৩), 'খেয়া' (১৯১০)/'হাস্যকৌতুক' (১৯০৭), 'ব্যঙ্গকৌতুক' (১৯০৭), 'মুকুট' (১৯০৮), 'প্রায়শ্চিত্ত' (১৯০৯), 'শারদোৎসব' (১৯০৯), /'চোখের বালি' (১৯০৩), 'নৌকাডুবি' (১৯০৬),/'আত্মশক্তি' (১৯০৫), 'ভারতবর্ষ' (১৯০৬), 'বিচিত্র প্রবন্ধ' (১৯০৭), 'প্রাচীন সাহিত্য' (১৯০৭), 'সাহিত্য' (১৯০৭), 'আধুনিক সাহিত্য' (১৯০৭), 'লোকসাহিত্য' (১৯০৭), 'শিক্ষা' (১৯০৮), 'রাজাপ্রজা' (১৯০৮), 'স্বদেশ' (১৯০৮), 'ধর্ম' (১৯০৯)।

গীতাঞ্জলি পর্ব ঃ গীতাঞ্জলি (১৯১০), 'গীতিমাল্য' (১৯১৪), 'গীতালি' (১৯১৫)/'রাজা' (১৯১০), 'অচলায়তন' (১৯১২), 'মালিনী' (১৯১২), 'ডাকঘর' (১৯১২)/'গোরা' (১৯১০)/ 'জীবনস্মৃতি' (১৯১২), 'শান্তিনিকেতন'।

বলাকা পর্ব — 'বলাকা' (১৯১৬), 'পলাতকা' (১৯১৮), 'পূরবী' (১৯২৫), 'মহুয়া' (১৯২৯), 'বনবাণী' (১৯৩১)/'ফাল্গুনী' (১৯১৬), 'রক্তকরবী' (১৯১৬), 'মুক্তধারা' (১৯২৫), 'কালের যাত্রা' (১৯৩২),/'ঘরে বাইরে' (১৯১৬), 'চতুরঙ্গ' (১৯১৬), 'যোগাযোগ' (১৯২৩), 'শেষের কবিতা' (১৯২৯)/ 'পরিচয়' (১৯১৬), 'জাপানযাত্রী' (১৯১৯), 'রাশিয়ার চিঠি' (১৯৩১)।

অন্ত্যপর্ব—'পুনশ্চ' (১৯৩২), 'বিচিত্রিতা' (১৯৩৩), 'শেষ সপ্তক' (১৯৩৫), 'বীথিকা' (১৯৩৫), 'পত্রপুট' (১৯৩৬), 'শ্যামলী' (১৯৩৬), 'খাপছাড়া' (১৯৩৭),' 'ছড়া ও ছবি' (১৯৩৭), 'প্রান্তিক' (১৯৩৮), 'সেঁজুতি' (১৯৩৮), 'আকাশ প্রদীপ' (১৯৩৯), 'প্রহাসিনী' (১৯৩৯), 'নবজাতক' (১৯৪০), 'সানাই' (১৯৪০), 'রোগশয্যায়' (১৯৪০), 'আরোগ্য' (১৯৪১), 'জন্মদিনে' (১৯৪১), প্রয়াণের পরে প্রকাশিত 'লেখা' (১৯৪১), 'ছড়া' (১৯৪৩), /'তাসের দেশ' (১৯৩৩), 'চিত্রাঙ্গদা' (১৯৩৬), 'চণ্ডালিকা' (১৯৩৭), 'শ্যামা' (১৯৩৯)/'দুই বোন' (১৯৩৩), 'মালঞ্চ' (১৯৩৪),'চার অধ্যায়' (১৯৩৪),/'মানুষের ধর্ম' (১৯৩৩), 'সাহিত্যের পথে' (১৯৩৬), 'কালান্তর' (১৯৩৭), 'সভ্যতার সঙ্কট' (১৯৪১)।

দেখা যায়, 'চারিদিকের অবস্থা ও আবহাওয়ার পরিবর্তনে' এবং নতুন নতুন অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি ও চেতনার ক্রমপরিণতির প্রভাবে কবির রচনা মোটামুটি দশ বছর অন্তর একটা করে বাঁক নিয়েছে এবং এক একটা পর্বে প্রাধান্য লাভ করেছে একএকটা বিষয় বা ভাবাদর্শ। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'শারদোৎসব থেকে আরম্ভ করে 'ফাল্গুনী (১৩১৫—১৩২২) পর্যন্ত যতগুলি নাটক লিখেছি, যখন বিশেষ করে মন দিয়ে দেখি তখন দেখতে পাই, প্রত্যেকের ভিতরকার ধুয়াটা এই একই।" শুধু বিশেষ একটি কালসীমায় বা কেবল নাটকের ক্ষেত্রেই নয়, এক একটা পর্বে কবির প্রায় সকল ধরনের লেখায় সাধারণভাবে প্রত্যয় বিশেষের প্রভাব পড়েছে; প্রকৃতি-প্রেম-মানুষ আধ্যাত্মিকতা, স্বদেশ ও বাস্তবতা সমাজ প্রভৃতির যে-কোনো একটি বা দুটি মুখ্য হয়ে উঠেছে। যেন একটার পর একটা বহু পুরনো সিন্দুকের মরচে-ধরা তালা খুলে কবি তার ভেতরকার রহস্য, এতকাল ধরে অনাবিষ্কৃত সঞ্চয় জাদুকরের মতো উদ্ঘাটন করেছেন; সামান্যের মধ্যে অসামান্যের সন্ধান পেয়ে আমরা পুলকিত হচ্ছি।

সুনির্দিষ্ট অভিপ্রায়-অভিমুখী কবিচেতনার ক্রমবিকাশের ধারাটি সুশৃঙ্খল ও ছন্দোবদ্ধ। কবির জীবনের মতো তাঁর সৃষ্টি-ও গতিশীল ও বৈচিত্র্যময়। শঙ্খ ঘোষ কবির জীবন বা শিল্পে 'সৌষম্যময় কোনো চলন' অনুভব করতে চেয়েছেন।

নদীর পথচলায় ছন্দ আছে; বর্ষায় সে নর্তকী-ও হয় বটে, তবু গ্রীষ্মে মরা গাঙে বা শরতে নিস্তরঙ্গ আলস্যে সেই ফেনিল ছন্দে ছেদ পড়ে না কি? কবির জীবনকবিতায় ও কবিতার জীবনে অনুসৃত ছন্দও শৃঙ্খলায় বা সুষম চলনে কখনও কোনো ব্যত্যয় ঘটেনি তো? আপন প্রত্যয় ও অভিপ্রায় থেকে বিচ্যুতি দেখা যায় না তো? ধারণাগত সত্য প্রকাশের ক্ষেত্রে আপন সত্তা পারিপার্শ্বিক প্রভাবে আচ্ছন্ন হয়ে যায়নি তো? বৃহত্তর জগৎ ও জীবনের সঙ্গে সংগতি সাধনের প্রয়াসে কোনো সমস্যা হয়নি তো? এইসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজাটা জরুরি কারণ তা রবীন্দ্রনাথের মানুষী, সাহিত্যিক, প্রাত্যহিক তথা বহুমাত্রিক মূর্তিটি আরও স্পষ্ট করে গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।

শরীরচর্চার (athletics) প্রতিযোগিতার মতো ব্যক্তিত্ব বিচারের ক্ষেত্রে নিখুঁত দশ (perfect 10) দেওয়ার সুযোগ থাকলে কিংবদন্তি ক্রীড়াবিদ নাদিয়া কোমানাচির মতো রবীন্দ্রনাথকেও স্বচ্ছন্দে তা দেওয়া যেত। পরিবারের সদস্য হিসেবে তিনি গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধাবান সন্তান, প্রেমময় স্বামী, স্নেহশীল পিতা; মানুষ হিসেবে স্বভাবকোমল, অতিথিবৎসল, সময়নিষ্ঠ ও শৃঙ্খলাপরায়ণ, নাগরিক হিসেবে সমাজসচেতন, শোষণ-অসহিষ্ণু ও আর্থ- সামাজিক-রাজনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে চিন্তাশীল এবং আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্বরূপে মনুষ্যত্বের প্রতি উৎপীড়ন উপেক্ষার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ও মুক্তিকামী, কল্যাণকামী। তিনি ধ্রুপদী সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার প্রতি কৌতূহলকে মিলিয়েছেন অসামান্য দক্ষতায়। উপনিষদের উপযোগবাদে আস্থাশীল বলে তিনি পাশ্চাত্য জ্ঞান ও প্রযুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছেন আবার ভোগসর্বস্ব আত্মকেন্দ্রিক নাগরিক সভ্যতার বিকার বা যন্ত্রযুগে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় হৃদয়হীন মকররাজের সর্বগ্রাসী লালসায় আঁতকে উঠেছেন। অসহায় কৃষ্ণাঙ্গদের প্রতি শ্বেতাঙ্গদের, গরিব জনসাধারণের ওপর ধনীদের শোষণ-অবিচারের বিরুদ্ধে তিনি প্রচুর লিখেছেন, ভাষণ দিয়েছেন; সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করেছেন নাৎসি ও ফ্যাসিস্ট সাম্রাজ্যবাদী স্বৈরাচারী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে।